ইউনিট ১০

ঐতিহাসিক বিবর্তন : পাকিস্তান আমলে বাংলা (১৯৪৭-১৯৭১)

ভূমিকা

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ। দীর্ঘ দু'শো বছর ইংরেজ শাসন ও শোষণের পর ভারত ও পাকিস্তান নামের দু'টি আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বাংলা অঞ্চল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কলকাতাসহ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল ভারতের অধীনে এবং ঢাকাসহ পূর্ব বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রটি বেশি দিন পর্যন্ত অখন্ড থাকতে পারেনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির অধিকার হরণের চেষ্টায় লিপ্ত হয়। প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটারের অধিক ভৌগোলিক ব্যবধান নিয়ে সৃষ্ট নতুন রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু ভাষী নেতা। সে সময়ের পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশের মানুষের প্রতি তাদের কোন সহানুভূতি ছিল না। তারা শুধু এ দেশকে শোষণ করতে চেয়েছিল। পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৬.৪০% মুখের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘিষ্ট মাত্র ৩.২৭% জনগোষ্ঠীর ভাষা উর্দুকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। জনসংখ্যার দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্য এ অঞ্চলের জনমনে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি করে। ফলে শুলুথেকেই স্বাধিকারের প্রশ্নে এই অঞ্চলের জনগণকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। সূচিত হয় ভাষা আন্দোলন। ১৯৪৮ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত উপেক্ষা করে উর্দু ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। প্রথমেই প্রতিবাদ মুখর হলো বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ। তারা এই অন্যায় বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়। এভাবেই ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত। সারা দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে উঠে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পৃথিবীতে ভাষার জন্য প্রথম শহীদ হলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে। রক্তের বিনিময়ে পূর্ববাংলা অর্জন করে ভাষার অধিকার। তথাপি পূর্বাঞ্চলের প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। ফলে পূর্ববাংলায় আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে। এরই পথ ধরে দানা বাঁধে ছয় দফা ও এগার দফার আন্দোলন। পরিণতিতে সংঘটিত হয় ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান। পাকিস্তানি শাসনযন্ত্রের হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র পূর্বপাকিস্তানিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

পাঠ ১

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- ভাষা আন্দোলনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও তাদের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভাষা, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, খাদ্যাভ্যাসসহ সকল ক্ষেত্রে বিস্তর ব্যবধান ছিল। কিন্তু এত ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও শুধু ধর্মের ভিত্তিতে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটারের অধিক ব্যবধানে অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি অসম রাষ্ট্র গড়ে তোলা হয়। ফলে পাকিস্তান নামক এই নতুন রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই বাঙালিকে শোষণ করার কৌশল হিসেবে বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। বাঙালি জাতি মাতৃভাষার ওপর আঘাতের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বেই পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা নিয়ে বিতর্ক শুলুহয় । ১৯৪৭ সালের ১৭ মে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান এবং একই বছর জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে উর্দুকে গ্রহণের পক্ষে মত দেন। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহসহ বেশ কয়েকজন বাঙালি লেখক, বুদ্ধিজীবী এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলার পক্ষে বক্তব্য দেন। পূর্ব বাংলায় ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে পত্র-পত্রিকায় মতামত প্রকাশ করতে শুরুকরেন।

বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি এসময়ে পূর্ব বাংলায় গঠিত বিভিন্ন সংগঠনও এই বিষয়ে গুলুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়। এটিই ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন। এই সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকাটিতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল বাঙালির সংস্কৃতি, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রশ্ন যা এই আন্দোলনের পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে।

ভাষা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পটভূমি

ভাষার ওপর আঘাত একটি জাতি এবং তার সংস্কৃতির ওপর আঘাতেরই শামিল। বাঙালি জাতিসত্তাকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যই বাংলা ভাষার ওপর আঘাত করা হয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকেই পূর্ব বাংলার সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ শুলুকরে। ফলে জনগণকে প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে খুবই গুলুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় সাংস্কৃতিক প্রশ্ন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলো পরের দিকে গুলুত্ব পেয়েছিল বেশি। বাংলা ভাষার উপর আক্রমণের বিলুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলন প্রতিরোধ আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

ভাষার মধ্যে ইসলামী রূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মের পর মুসলিম লীগের রক্ষণশীল অংশ পূর্ববাংলার ক্ষমতায় বসে 'রেনেসাঁ সোসাইটি' ও 'সাহিত্য সংসদ' গঠন করে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিশেষ ধরনের নীতি গ্রহণ করে। প্রথমেই তারা বাংলা ভাষার মধ্যে একটি ইসলামী রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রচুর আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহারে উৎসাহ দিতে থাকেন। আরবি হরফে বাংলা লেখার ইচ্ছাও তখন ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষায় আরবি হরফ চালুর চেষ্টা করে। এরপর আরবিতে বাংলা শিক্ষা দেয়া শুলুহয়। চালু হয় এ ধরনের অনেকগুলো শিক্ষাকেন্দ্র। সেখানে বয়স্ক ছাত্রদের বিনামূল্যে আরবি হরফের বই দেওয়া হতে থাকে। পূর্ববাংলার জনগণ কিছুদিনের মধ্যেই পাকিস্তানিদের অসাধু উদ্দেশ্য

বুঝতে পারে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। ফলে সরকারের অসৎ উদ্দেশ্যের বিলুদ্ধে প্রবল জনমত সৃষ্টি হতে থাকে। প্রথমে এগিয়ে আসে পূর্বপাকিস্তান মুসলিম লীগের 'ভাষা কমিটি'। এই কমিটির বক্তব্য ছিল, পূর্ববাংলার মানুষকে অশিক্ষিত বানানোর জন্যই শাসকদের এই ষড়যন্ত্র। প্রবল নিন্দা জানায় 'পাকিস্তান তমুদ্দুন মজলিশ'। প্রতিবাদে ফেটে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীসহ অনেকেই।

বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি

পূর্ব বাংলার জনগণের আন্দোলনের মুখে প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁকে সভাপতি এবং কবি গোলাম মোস্তফাকে সম্পাদক করে একটি সংস্কার কমিটি গঠন করে। দেড় বছর ব্যাপক আলাপ আলোচনার পর কমিটি সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টে বাংলা ভাষা, ব্যাকরণ ও বর্ণমালার প্রচুর সংস্কারের পরামর্শ দেয়া হয়। নতুন ভাষার নামকরণ হয় 'সহজ বাংলা'। কমিটি রোমান বা উর্দু হরফে বাংলা লেখার প্রশ্নকে কমপক্ষে বিশ বছরের জন্য স্থগিত রাখার পরামর্শ দেয়। এ সময়ের মধ্যে উর্দু ভাষাকেও প্রয়োজনীয় সংস্কারের আহ্বান জানায়। এই রিপোর্টটি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পছন্দ হয়নি বলেই তা শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা

ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে শুলুথেকেই যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তার মধ্য থেকে জন্ম নিতে থাকে অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদানের জন্য ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে গঠিত হয় প্রথম 'রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। এর আহ্বায়ক মনোনিত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূলুল হক ভূঁইয়া। ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সংস্কৃতি সংসদ' নামে আরেকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। এই সংগঠনটি ক্রমে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। ১৯৫২ সালের শেষদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'। সংসদের নিয়মিত পাক্ষিক সাহিত্য সভা বসত। এ সমস্ত সংগঠনের তৎপরতার মধ্য দিয়ে ভাষা প্রশ্নের গুলুত্ব মানুষের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। তারা বুঝতে পারে রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হলে পূর্ববাংলায় সব ধরনের উন্নতি থেমে যাবে। তমুদ্দুন মজলিশ পুস্তিকা প্রকাশ করে জানিয়ে দেয় পূর্ববাংলার শিক্ষার বাহন, আইন আদালত ও অফিসের ভাষা বাংলা করতে হবে।

এভাবে ভাষা আন্দোলনের একটি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে যায়। যার শক্তির উপর দাঁড়িয়ে রূপ লাভ করে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে।

সার-সংক্ষেপ

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই একটি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ থেকে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুলুথেকেই পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ববাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা শুলুকরে। এ দেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলার পরিবর্তে তারা উর্দু করতে চায়। আর এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করতে থাকে। এদেশের মানুষের কাছে এই অসৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়ে যায়। ফলে ধীরে ধীরে জন্ম নেয় অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের তৎপরতায় মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তারা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। এরই পরিণতিতে সংঘটিত হয় ভাষা আন্দোলন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. আরবি হরফে বাংলা লেখা চালু করার চেষ্টা নেয়া হয় —
   ক. ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে

২. রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার পক্ষে প্রথম এগিয়ে আসে —
   ক. সাংস্কৃতিক সংসদ খ. পাকিস্তান তমুদ্দুন মজলিশ
   গ. পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ ঘ. বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি

৩. বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য ভাষা কমিটি গঠন করা হয় —
   ক. ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তান সরকার কী পদক্ষেপ নিয়েছিল।
২. ভাষা সংস্কার কমিটির ভূমিকা ব্যাখ্যা কলুন।
৩. ভাষা আন্দোলনের পূর্বে গঠিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দিন।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- ভাষা আন্দোলনের সূচনা কীভাবে হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও এর ভূমিকার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ২১শে ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত আন্দোলন সম্পর্কে বলতে পারবেন।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন

১৯৩৭ সাল থেকে ভাষা বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে- ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এর আহ্বায়ক মনোনীত হন নূলুল হক ভূঁইয়া। পরবর্তীকালে এ উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে তমদ্দুন মজলিসের গঠিত প্রথম সংগ্রাম পরিষদটি গুলুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান আশ্বাস দেন যে, মানি অর্ডার, ফরম, ডাকটিকিট ও মুদ্রায় ইংরেজি-উর্দুর পাশাপাশি বাংলায় লেখা হবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৮ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া বক্তৃতায় সুকৌশলে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে ছাত্রদের মধ্যে হতে 'না' 'না' ধ্বনি সম্বলিত প্রতিবাদ ওঠে।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এক অধিবেশনে নিম্নপর্যায় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ২৩

ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু মুসলিম লীগের সদস্যদের ভোটে তা অগ্রাহ্য হয়। এই সংবাদ ঢাকায় পৌছুলে এদেশের ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারে মাতৃভাষার মর্যাদা রাখতে হলে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজন। ২৬ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ২ মার্চ ছাত্রসমাজ দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। এ পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম। শুলুহয়ে যায় একের পর এক আন্দোলনের কর্মসূচি। নবগঠিত পরিষদ ১১ মার্চ হরতাল আহ্বান করে। হরতাল চলাকালে শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল আলমসহ ৬৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ১৩-১৫ মার্চ ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। আন্দোলন তীব্রতর হলে নাজিমুদ্দিন ১৫ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ৮দফা চুক্তিতে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি, তদন্ত কমিটি গঠন, শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ও ব্যবস্থাপক সভায় রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বিষয় উত্থাপনে রাজি হন। কিন্তু ৬ এপ্রিল পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশনে নাজিমুদ্দিন সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ১৫ মার্চের চুক্তি ভঙ্গ করে উর্দুকে পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব করেন। পরিষদের বিরোধী দলের প্রতিবাদের ফলে প্রস্তাবটি পরিষদে উত্থাপিত হলেও বাস্তবায়ন হয়নি।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কঠোর নীতি

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় আসেন। ২১ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন 'উর্দুই এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। উপস্থিত ছাত্ররা 'না না' ধ্বনি দিয়ে এর প্রতিবাদ জানায়। আন্দোলনকারীদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। জিন্নাহর এ ঘোষণা পূর্ব বাংলার জনমনে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করে। এ সময়ে সারা পূর্ব পাকিস্তানেই ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রি লিয়াকত আলী খান ঢাকায় এসে বক্তৃতাকালে আবার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। তখনও ছাত্ররা 'না না' বলে প্রতিবাদ করে উঠে।

সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন কর্মসূচি

১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সময়কে ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব বলা যায়। এই সময়ে আরবি হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্র শুলুহয়। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে আকরাম খানকে সভাপতি করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী 'পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করে। এই কমিটি গঠনের প্রতিবাদ জানায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫০ সালের ১১ মার্চ আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদ কর্তৃক গঠিত মূলনীতি কমিটির সুপারিশে বলা হয়, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'। দেশ জুড়ে এর প্রতিবাদে সভাসমাবেশ চলতে থাকে। ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর হাতে নিহত হন। তখন তাঁর স্থলে প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দিন। ১৯৫২ সালে ঢাকায় খাজা নাজিমুদ্দিনের এক উক্তিকে কেন্দ্র করে ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা ও সর্বাত্মক রূপ লাভ করে।

একুশে ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত আন্দোলন

খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ব বাংলার প্রধান মন্ত্রীর পদ ছেড়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকা সফরে আসেন। ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানের জনসভায় তিনিও জিন্নাহর মতো ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' এর প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলন নতুন করে শুলুহয়ে যায়। এবার প্রতিবাদে ফেটে পড়ে ছাত্র জনতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৩০ জানুয়ারি সভা ও ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ৪ ফেব্রুয়ারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ৩১ জানুয়ারি আওয়ামী মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সর্বদলীয় সভায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে ৪০সদস্য বিশিষ্ট সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এই সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশনের দিন দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সরকার আন্দোলনকে কঠোর হাতে দমন করার কৌশল গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মূখ্যমন্ত্রী নূলুল আমীন আন্দোলন দমন করার জন্য ২০ তারিখ থেকে পরবর্তী এক মাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করেন। এর মাধ্যমে ঢাকায় যে কোন প্রকার সভা, সমাবেশ, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ছাত্ররা সরকারি এই সিদ্ধান্ত কোনভাবেই মেনে নিতে পারেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়রে বিভিন্ন হলে সভা করে তাঁরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে। এই বৈঠকে আবদুল মতিন, ওলি আহাদ, গোলাম মাহবুব প্রমুখ নেতারা ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে জোড়ালো মত দেন। অবশেষে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় (বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের চত্বর) ছাত্রদের সমাবেশে ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী যোগ দেয়। সভায় ছোট ছোট দলে ছাত্ররা মিছিল করে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়। ছাত্র-ছাত্রীরা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে মিছিল করতে থাকলে পুলিশ তাদের ওপর লাঠি চার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। ফলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। বিকেলে ব্যবস্থাপক পরিষদের সভার দিকে প্রতিবাদ মিছিল অগ্রসর হতে গেলে পুলিশ গুলি ছুঁড়ে। মাতৃভাষার দাবি জানাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন আবুল বরকত, আবদুস সালাম, রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার এবং আহত হন কয়েকজন ছাত্রীসহ অনেকে। সে সময়ে গণপরিষদের অধিবেশন চলছিল। গুলির খবর পেয়ে আবদুর রশীদ তর্কবাগীশসহ আইন পরিষদের কয়েকজন সদস্য অধিবেশন ত্যাগ করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। ২১ শে ফেব্রুয়ারির ঘটনা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

২২ শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতা শহীদদের জন্য শোক মিছিল বের করে। আবারও মিছিলের ওপর পুলিশ ও মিলিটারি লাঠি, গুলি ও বেয়োনেট ব্যবহার করে। এতে শফিউর রহমানসহ আরও কয়েকজন শহীদ হন। অনেকে গ্রেফতার হন। যে স্থানে ছাত্রদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল সেই স্থানে ছাত্ররা সারারাত জেগে ২৩ ফেব্রুয়ারিতে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করে। পুলিশ শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে দেয়। ২১ ফেব্রুয়ারির হত্যাকান্ড ও নিপীড়নের প্রতিবাদে ঢাকা শহরে ২৩ ফেব্রুয়ারি হরতাল পালিত হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ফুলার রোডে একজন কিশোর নিহত হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। ডা. সাঈদ হায়দারের নকশা অনুসারে রাতে মেডিকেল কলেজের গেইটের সামনে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয় এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি তা উদ্বোধন করা হয়। ১৯৬৩ সালে অস্থায়ী শহীদ মিনারের

স্থলে শিল্পী হামিদুর রহমানের নকশা ও পরিকল্পনায় শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে দেয়। ১৯৭২ সালে পূর্বের নকশা অনুযায়ী বর্তমান শহীদ মিনারটি পুনরায় নির্মাণ করা হয়।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

ভাষা আন্দোলনের গুলুত্ব ও তাৎপর্য

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের বিলুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম বিদ্রোহ। ভাষা আন্দোলন তৎকালীন রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরের বছর থেকে প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি বাঙালির শহীদ দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন ঘোষিত হয়। নিম্নে এর গুলুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা করা হলো।

প্রথমত, ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে সংগঠিত গণ আন্দোলন। এটি শুধু ভাষার মর্যাদার জন্যই গড়ে ওঠেনি। ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায় হিসেবে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠাকে বাঙালিরা বেছে নেয়। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাই ষাটের দশকে স্বৈরশাসন বিরোধী ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে আন্দোলনে প্রেরণা জোগায়।

দ্বিতীয়ত, ভাষা আন্দোলনের ফলে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটে। এই আন্দোলন দ্বিজাতি তত্ত্বের ধর্মীয় চেতনার মূলে আঘাত হানে। পাকিস্তান সৃষ্টির সাম্প্রদায়িক ভিত্তি ভেঙ্গে বাঙালিরা অসাম্প্রদায়িক চেতনার আন্দোলন শুলুকরে। এর ফলে ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, ভাষা আন্দোলনে মুসলিম লীগ জনগণের মানসিকতা ও স্বার্থ উপেক্ষা করে জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে দলটি শোচনীয়ভাবে পরাজয় ঘটে। এর পর আর কোন নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয়ী হয়নি।

চতুর্থত, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ২১ ফেব্রুয়ারি শোক দিবস হিসেবে ছুটি ও শহীদ দিবস ঘোষণা করে। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়। ১৯৬২ সালে সংবিধানে তা বহাল থাকে।

পঞ্চমত, যুক্তফ্রন্ট পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য, ভাষা বৈষম্য তুলে ধরে। যা ষাটের দশকে আওয়ামী লীগের ৬ দফায় পরিস্ফুটিত হয়। স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয় যার প্রেরণা ছিল ভাষা আন্দোলন।

ষষ্ঠত, ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর স্বীকৃতি দান আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

ভাষা আন্দোলনের শহীদগণ

সার-সংক্ষেপ

ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনগণের জীবনে এক গুলুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মাতৃভাষাকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ সময় পূর্ববাংলার ছাত্র সমাজ জীবন বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা করেনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতেই শাসকদের কাছ থেকে পূর্ব বাংলার জনগণ কোন সহানুভূতি পায়নি। তাই তাদেরকে প্রতিবাদ করতে হয়েছে। তারা হয়েছে সংঘবদ্ধ। শেষ পর্যন্ত তাদের চূড়ান্ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। মায়ের ভাষাকে রক্ষা করেছে বুকের রক্ত দিয়ে। এই ঘটনা পূর্ববাংলার জনগণের মনের শক্তিকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অধিকার আদায়ের সব আন্দোলনে একুশের চেতনা সরাসরি ভূমিকা রেখেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বেই উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলেছিলেন —
   ক. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ. খাজা নাজিমউদ্দীন
   গ. শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান ঘ. চৌধুরী খালেকুজ্জামান

২. 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে —
   ক. গণতান্ত্রিক যুবলীগ খ. তমদ্দুন মজলিশ
   গ. মুসলিম লীগ ঘ. সাংস্কৃতিক সংসদ

৩. সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য সংগ্রাম পরিষদের সাথে আট দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেন —
   ক. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ. খাজা নাজিমউদ্দীন
   গ. শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান ঘ. চৌধুরী খালেকুজ্জামান

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ভাষা আন্দোলনের সূচনা কীভাবে হয়েছিল?
২. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও এর ভূমিকা বর্ণনা করুন।
৩. ভাষা আন্দোলনের গুলুত্ব ও তাৎপর্য লিখুন।

পাঠ ৩

পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- পাকিস্তানি শাসকরা কীভাবে পূর্ববাংলার সম্পদ শোষণ করার চিন্তা করেছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পূর্ববাংলার প্রতি পাকিস্তানিদের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র কেমন ছিল তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার জনগণ কতটা বৈষম্যের শিকার হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- পূর্ববাংলার জনগণের প্রতি পাকিস্তানিদের বৈষম্যের প্রতিক্রিয়া কতটুকু সৃষ্টি হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলেও পূর্ব বাংলা কখনোই লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়নি। বরং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারের দাবিতে পূর্ব বাংলাকে সুদীর্ঘ ২৪ বছর আন্দোলন ও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে। এ সুদীর্ঘ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতি অনুসরণ করে। শাসকগোষ্ঠীর এ বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতির বিলুদ্ধে পূর্ব বাংলায় প্রথমে প্রতিবাদী আন্দোলন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয় যার সফল পরিণতি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

পূর্ববাংলার সম্পদ শোষণ

পূর্ব বাংলার সাথে পাকিস্তানি শাসকবর্গ প্রথম থেকেই বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল দুটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল নিয়ে। দুটি অঞ্চল সমান সম্পদের অধিকারি ছিল না। পূর্ব বাংলা ছিল প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে সমৃদ্ধ। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান আয়তনে বড় হলেও অধিকাংশ অঞ্চল ছিল অনুর্বর ও মলুময়। সেখানে কৃষির কোন সম্ভাবনা ছিল না। এ অঞ্চল আর্থিক দিক থেকে ছিল দুর্বল। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে এখানে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। অন্যদিকে পূর্ব বাংলায় রপ্তানি পণ্য হিসেবে পাট, চা ও চামড়ার যোগান ছিল বেশি। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে পূর্ববাংলা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ দেশকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে দেশের মানুষকে বঞ্চিত করে এদেশের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেত। ফলে ক্রমশ পশ্চিম পাকিস্তান সমৃদ্ধ হতে থাকে।

রাজনৈতিক বৈষম্য

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুলুথেকেই পূর্ব বাংলা রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ট প্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে গভর্নর

জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী উভয়পদেই নিয়োগ দেয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। পূর্ব বাংলার মতামত উপেক্ষা করে পাকিস্তানের রাজধানী করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে এবং পরে তা ইসলামাবাদে স্থানান্তর করা হয়। পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় নেতাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। এমনকি সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও পূর্ব বাংলাকে সংখ্যা সাম্যনীতি মানতে বাধ্য করা হয়। পাকিস্তানের জনসংখ্যার প্রায় ৫৬% বাঙালি হলেও একমাত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আমল ছাড়া ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ২৫%-৪৭% অতিক্রম করেনি। ঐ সময়ে মোট ২২১ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে বাঙালি ছিল মাত্র ৯৫ জন। আর ৯ জন সরকার প্রধানের মধ্যে মাত্র ৩ জন (খাজা নাজিমুদ্দিন, সোহরাওয়ার্দী ও মোহাম্মদ আলী বগুড়া) ছিলেন পূর্ব বাংলার। সময়ের হিসেবে ২৪ বছরের মধ্যে মাত্র ৬ বছর (২৫% সময়) পূর্ববাংলার মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। জেনারেল আইয়ুব খানের আমলে (১৯৫৮-৬৯) মন্ত্রিসভার মোট ৬২ জন মন্ত্রীর মধ্যে বাঙালি ছিলেন মাত্র ২২ জন (৩৫.৪৮%)। তবে এসব বাঙালিদের মধ্যে কেউ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাননি।

প্রশাসনিক বৈষম্য

১৯৬০-৭০ সাল পর্যন্ত একটি হিসেব থেকে দেখা যায়, পাকিস্তানের মন্ত্রীপরিষদ, পররাষ্ট্র, কৃষি, সংস্থাপন, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, শিল্প, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ, তথ্য ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মোট ৬৯ জন শীর্ষ কর্মকর্তার মধ্যে ৪৫ জনই ছিলেন পাঞ্জাবি। বাঙালি ছিলেন মাত্র ৩ জন। বেসামরিক সিএসপি কর্মকর্তাদের মধ্যে ১৯৪৮-৬৩ পর্যন্ত ৩৪৬ জনের মধ্যে মাত্র ১২৬ জন (৩৬.৪%) ছিলেন বাঙালি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ছিলেন ২১৮ জন (৬৩.৬%)।

সামাজিক বৈষম্য

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। সরকারের অর্থনৈতিক এবং পরিকল্পনাগত বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তান প্রথম থেকেই বঞ্চনার শিকার হয়। পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে দু'ধরণের সমাজ জীবন পরিচালিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরদের জীবন যাপন উন্নতমানের হলেও পূর্ব বাংলার মানুষ ছিল বৈষম্যের শিকার। বাঙালিরা যাতে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে না পারে এজন্য তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগগ্রস্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যেও দামের পার্থক্য থাকতো, যাতে তা বাঙালিদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে থাকে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সেবার জন্য অনেক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠলেও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে সার্বিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের জীবনযাত্রার মান ছিল অনেক উন্নত।

প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যের প্রকাশ ঘটে সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে। সামরিক বাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের আধিপত্য ছিল। ক্ষমতার শীর্ষে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। তাদের এই বৈষম্যমূলক নীতি সামরিক বাহিনীতে নিয়োজিত বাঙালি সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। ক্রমশ এই অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। উল্লেখ্য, সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবি আধিপত্য নিশ্চিত করতে

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে প্রাদেশিক কোটা নির্ধারণ করা হয়। এতে ৬০% পাঞ্জাবি, ৩৫% পাঠান এবং বাদবাকি ৫% পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য এলাকা ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়োগ করার বিধান চালু করা হয়।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পাকিস্তানি শাসনামলে অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র ছিল ভয়াবহ। ফলে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। পূর্ববাংলা ছিল সম্পদশালী। এই সম্পদ এদেশবাসী ভোগ করতে পারত না। পাকিস্তানি শাসকরা তা ছিনিয়ে নিত। পুরো পাকিস্তানের আয়ের ৬০ ভাগ আয় হতো পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব হতে। অথচ আমাদের অঞ্চলে এর মাত্র ২৫ ভাগ ব্যয় করা হতো। আর বাকি সব নিয়ে যাওয়া হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানের রপ্তানি আয়ের ৬০ ভাগ যেত পূর্বপাকিস্তান থেকে। কিন্তু পূর্বপাকিস্তানকে আমদানি দ্রব্যের মাত্র ২৫ ভাগ দেয়া হতো। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৬০ ভাগের বসবাস ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। কিন্তু জাতীয় আয়ের মাত্র ২৭ ভাগ ব্যয় করা হতো এ অঞ্চলের জন্য। পাকিস্তানের অর্থ ভাণ্ডার পরিপুষ্ট হয়েছে পূর্ববাংলার সম্পদে। কিন্তু এ দেশের উন্নয়নের দিকে কোন নজর দেয়া হয়নি। তাই উর্বর পূর্ববাংলা বার বার বন্যা ও ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। আর মলুময় পশ্চিম পাকিস্তান হয়েছে আমাদের সম্পদে শস্য-শ্যামল। শিল্পের কাঁচামাল পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হলেও বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তারও মালিকানা থেকে যায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। কৃষি উন্নয়নের জন্য যে ঋণ পাওয়া যেত তার সিংহভাগ কৃষিভিত্তিক অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় না করে ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক এরূপ শোষণমূলক নীতি অনুসরণের ফলে ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। শোষণের বিলুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্যদিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাধতে থাকে এবং এ আন্দোলন ক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ লাভ করে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও বাঙালিরা সুস্পষ্ট বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের অশিক্ষিত রেখে তাদের শাসনকে পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিল। কৃষি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কেন্দ্রের বেলায় ১৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৩টিই অবস্থিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিভিন্ন বৃত্তির সিংহভাগ সুবিধা পায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা। পূর্ব বাংলায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও আনুপাতিক হারে বিদ্যালয় সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বৈষম্যের ফলে ১৯৪৭-৪৮ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববাংলায় যেখানে শিক্ষিতের হার পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি ছিল সেখানে প্রায় বিশ বছরের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষিতের হার পূর্ববাংলার চেয়ে অনেক বেড়ে গেল।

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

উল্লেখ্য, ১৯৫৫-৫৬ থেকে ১৯৬৬-৬৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষাখাতে ২০৮৪.৬ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ হলেও পূর্ব পাকিস্তানে করা হয়েছে মাত্র ৭৯৭.৬ মিলিয়ন রুপি অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ মাত্র।

চাকুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য

চাকুরি ও নিয়োগের ক্ষেত্রেও পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য প্রকটভাবে লক্ষ করা যায়। পূর্ববাংলাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে তারা চাকুরির প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। সিভিল, মিলিটারি ও অন্যান্য চাকরির মূল নিয়োগ দানের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়

পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে নিজেদের মত করে নীতি নির্ধারণ করা সহজ হতো। দেখা যাচ্ছে, সামরিক বাহিনীর সকল পর্যায়ের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরির ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের প্রধান দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। অনেক চাকরির বিজ্ঞাপন পূর্ববাংলার সংবাদপত্রে দেয়াই হতো না। এ ছাড়াও মনোনয়ন বোর্ডের অধিকাংশ সদস্যই হতেন পশ্চিম পাকিস্তানি। এসব কারণে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের পক্ষে উচ্চ পদে নিয়োগ পাওয়া ছিল খুব কঠিন।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা ছিল পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ। এদের ভাষা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল হাজার বছরের পুরনো। অন্যদিকে পাকিস্তানের বাকি ৪৫ শতাংশ লোকের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল বিভিন্ন ধরণের। এদের মধ্যে মাত্র ৭.২ শতাংশ লোকের ভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করতে চেষ্টা করে। এছাড়াও হাজার বছরের পুরনো বাঙালি জাতির সংস্কৃতিকে মুছে ফেলে বাঙালিদের পাকিস্তানি করণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাদের এই বৈষম্য বাঙালিরা মেনে নিতে পারেনি। তাই পূর্ব বাংলায় সাংস্কৃতিক বৈষম্যের বিলুদ্ধে প্রথমে প্রতিবাদ এবং পরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

বৈষম্য নীতির প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যের চিত্র প্রকাশিত হয়ে পড়লে পূর্ববাংলার জনগণ স্বাভাবিকভাবেই বিক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে আর একটি দেশও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে একই রাষ্ট্রের এক অঞ্চলের উপর অন্য অঞ্চলের এমন ব্যাপক অর্থনৈতিক শোষণ ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন চলে। যতদিন পর্যন্ত এই বৈষম্যের বিষয়টি পূর্ববাংলার জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়নি ততদিন স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেনি। কিন্তু ক্রমে পাকিস্তানিদের চরিত্র প্রকাশিত হয়ে পড়লে এ অঞ্চলের জনগণ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। বৈষম্য নীতির বিলুদ্ধে কয়েক পর্যায় প্রতিক্রিয়া দেখা যায়-

প্রথমত, পাকিস্তানি শাসকদের শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের বিলুদ্ধে পূর্ব বাংলায় প্রথম প্রতিবাদ গড়ে ওঠে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নকে নিয়ে। ৫৫% লোকের বাংলা ভাষা উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে ব্যাপক আন্দোলন দেখা যায়। ভাষা আন্দোলন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শক্তির বিলুদ্ধে প্রথম বিজয়।

দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানি শাসকদের শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের বিলুদ্ধে পূর্ব বাংলায় দ্বিতীয় প্রতিবাদ ছিল ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন। এই নির্বাচনে বৈষম্যের বিলুদ্ধে ব্যালটের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে পরাজিত করা হয়। শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে মুসলিম লীগ রাজনীতি থেকে চির বিদায় নেয়।

তৃতীয়ত, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির বিলুদ্ধে বাঙালিরা আবার প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খানের সংবিধানের বিলুদ্ধে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়। এই আন্দোলন ক্রমে শিক্ষা রিপোর্টের বিলুদ্ধে আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ক্রমান্বয়ে ছয় দফা ভিত্তিক, আগরতলা মামলা বিরোধী সর্বোপরি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খানের পতনের মাধ্যমে বৈষম্য বিরোধী প্রতিক্রিয়া সফল হয়।

চতুর্থত, পাকিস্তানি সরকার কর্তৃক শাসন ও শোষণের বিলুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ ছিল **১৯৬৬** সালে ছয় দফা দাবি উত্থাপন। ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

পঞ্চমত, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে বাঙালির রায় ছিল বৈষম্যের বিলুদ্ধে সফল প্রতিবাদ। যদিও বাঙালি জাতিকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় বাঙালি রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে।

সার-সংক্ষেপ

পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে অভিন্ন দেশ পাকিস্তানের সৃষ্টি হলেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের কাছ থেকে পূর্ববাংলা সমান দৃষ্টি ও সহানুভূতি পায়নি। তার বদলে সম্পদশালী পূর্ববাংলাকে শোষণ করে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে ফেলা হয়। শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাকুরি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হয় পূর্ববাংলা। অবশেষে বাঙ্গালিদের কাছে পরিষ্কার হয় পাকিস্তানি শাসকচক্রের শোষকের চেহারা। তারা ক্রমে আন্দোলনমুখর হয়ে পড়ে অধিকার আদায়ের জন্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. পূর্ববাংলার জন্য পাকিস্তানের মোট জাতীয় আয় থেকে ব্যয় করা হতো —
   ক. ষাট ভাগ খ. সাতাশ ভাগ
   গ. পঁচিশ ভাগ ঘ. পনেরো ভাগ

২. ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ববাংলায় শিক্ষিতের হার পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে —
   ক. কম ছিল খ. সমান ছিল
   গ. কাছাকাছি ছিল ঘ. বেশি ছিল

৩. পাকিস্তানি আমলে বাঙালিদের উচ্চপদে নিয়োগ পাওয়া —
   ক. সহজ ছিল খ. স্বাভাবিক ছিল
   গ. কঠিন ছিল ঘ. একটি সাধারণ বিষয় ছিল

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ববাংলার সম্পদ শোষণের চিন্তা কীভাবে করেছিল?
২. পূর্ববাংলার প্রতি পাকিস্তানি শাসকগণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কেমন বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল?

পাঠ ৪

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- কীভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচন, নির্বাচনের ফলাফল ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন একটি গুলুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাঙালি জাতি, বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি এবং বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিলুদ্ধে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের কার্যকলাপ ও পাকিস্তানি শাসকদের ছয় বছরের শোষণের বিলুদ্ধে এই নির্বাচন ছিল 'ব্যালট বিপ□ব'। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির কয়েক বছরের মধ্যেই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিভিন্ন উপদল, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ব্যর্থ শাসন, অঞ্চলভেদে বৈষম্যমূলক নীতি প্রভৃতির কারণে নতুন নতুন রাজনৈতিক দল গঠন জলুরি হয়ে পড়ে। বিশেষ করে এই সময়ে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ শাসনের চরম ব্যর্থতার ফলে *আওয়ামী মুসলিম লীগ*, *কৃষক-প্রজা পার্টি*, *পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি*, *নেজাম-ই-ইসলামী*, *পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস* প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার পরাজয়ের ভয়ে নানা টালবাহানায় নির্বাচনের তারিখ বারবার পিছিয়ে দেয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য স্ব-স্ব জনসমর্থন যাচাইয়ের একটি সুযোগ সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের জাতীয় রাজনীতিতে এই নির্বাচন সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

যুক্তফ্রন্ট গঠন

পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকারের প্রতি মুসলিম লীগ কোন সম্মান দেখায়নি। তাই তাদের প্রতি পূর্ব বাংলার জনগণের কোন আস্থা ছিল না। মুসলিম লীগ সরকার বার বার নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের সম্মুখীন হয়। বিক্ষুদ্ধ মানুষের চাপের মুখে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ ছিল সবচেয়ে পুরাতন ও বড় রাজনৈতিক দল। বিভিন্ন দলের রাজনীতিবিদগণ বুঝতে পারেন ক্ষমতাসীন সরকারী দল মুসলিম লীগের সাথে নির্বাচনে জয়লাভ করা কঠিন হবে। ইতোমধ্যেই ১৯৪৯ সালে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা নেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। দলগুলো ছিল মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক-শ্রমিক পার্টি, মওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন নেজাম-ই-ইসলামী এবং হাজী দানেশের বামপন্থী গণতন্ত্রী দল। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা। ২১ ফেব্রুয়ারিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য যুক্তফ্রন্টের ইশতেহার করা হয় ২১ দফা। ২১ দফা কর্মসূচির মুখ্য রচয়িতা ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। যুক্তফ্রন্ট তাদের ঐতিহাসিক ২১ দফা দাবিতে গণমানুষের অধিকারের কথা তুলে ধরে। এই দফাগুলো সংক্ষেপে বর্ণিত হলো:

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা
২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ করা এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ
৩. পাটের ব্যবসায় জাতীয়করণ করা
৪. সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রর্বতন করা
৫. পূর্ব পাকিস্তানে লবণ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা
৬. কারিগর মুহাজিরদের কাজের ব্যবস্থা করা
৭. বন্যা ও দুর্ভিক্ষ রোধের জন্য খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করা
৮. শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা
৯. অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা
১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা
১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা
১২. শাসন ব্যয় হ্রাস করা ও মন্ত্রীদের বেতন এক হাজার টাকার বেশি না করা
১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা
১৪. জন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি বাতিল করা
১৫. বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথকীকরণ করা
১৬. মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন 'বর্ধমান হাউস'কে বাংলা ভাষা গবেষণাগারে পরিণত করা
১৭. বাংলা ভাষা করার দাবিতে নিহত শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শহীদ মিনার নির্মাণ করা
১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা
১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান
২০. আইন পরিষদের মেয়াদ কোনভাবেই বৃদ্ধি না করা
২১. আইন পরিষদের আসন শূন্য হলে তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচন দিয়ে তা পূরণ করা।

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও ফলাফল

১৯৫৪ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রধানত স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে। ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চের নির্বাচন ছিল পূর্ব বাংলায় প্রথম অবাধ ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে শতকরা ৩৭.১৯ ভাগ ভোটার ভোট দেয়। ২ এপ্রিল নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট। মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩টি আসন। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পায় ৯টি আসন। পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস ২৪টি, তফসিল

ফেডারেশন ২৭টি, খেলাফতে রব্বানী ২টি, খ্রিস্টান ১টি, বৌদ্ধ ১টি, কম্যুনিস্ট পার্টি ৪টি আসন লাভ করে। নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী নূলুল আমীনসহ মুসলিম লীগের বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা পরাজিত হন। মূলত মুসলিম লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতা, রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তাদের অবস্থান, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা, পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক দুর্গতি ও নেতৃত্বের জনবিচ্ছিন্নতাই মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ।

নির্বাচনের তাৎপর্য

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রথম অবাধ নির্বাচন। এ নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের অন্যায়, বৈষম্যমূলক, ব্যর্থ শাসনের বিলুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় এ অঞ্চলের মানুষের মনে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তাদের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জোরদার হয়। বাঙালি জাতি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে বুঝিয়ে দেয় যে তারা পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে আর চায় না। যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে তলুণ নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা পূর্ব বাংলার ভবিষ্যত নেতৃত্ব তৈরির পথ সুগম করে। কারণ অনেক তলুণ নেতার কাছে মুসলিম লীগের বড় বড় নেতৃত্বের পরাজয় ঘটে। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভের মধ্যে দিয়ে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ ধারার সৃষ্টি হয়। বাঙালিরা বুঝতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানি ও তাদের এদেশিয় দোসরদের দ্বারা বাঙালির প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়। তাই তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে। অন্যদিকে বিভিন্ন দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হওয়ায় এই দলের ভেতর স্বাভাবিকভাবেই ভিন্নমতের নেতাদের উপস্থিতি ছিল। নির্বাচনে জয়লাভ করলেও যুক্তফ্রন্টের এই দুর্বলতা থেকে গিয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের এই দুর্বলতার বিষয়টি মুসলিম লীগের চোখে তেমন একটা ধরা পড়েনি। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে তারা খুব ভীত হয়ে পড়ে। এবার সুযোগ খুঁজতে থাকে কিভাবে এই বিজয়ের ফলাফলকে বানচাল করা যায়।

মন্ত্রিসভা গঠন

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। যুক্তফ্রন্টের অন্যতম নেতা সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকায় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ৪ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রী সভার মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি নিজে মুখ্যমন্ত্রির দায়িত্ব ছাড়াও অর্থ, রাজস্ব ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব নেন। মে মাসে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আবু হোসেন সরকার বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক শিক্ষা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি, সমবায় ও পল-ী উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেন। শেরে বাংলা এবং যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ব্যাপারে চেষ্টা চালাতে থাকেন। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই মন্ত্রিসভা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং বর্ধমান হাউজকে বাংলা একাডেমী করার প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করেন। কেন্দ্রীয় সরকার এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অবসান

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। তাই শুলুথেকেই তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিলুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরুকরে। এ সময়ে এ. কে. ফজলুল হক কলকাতা সফরে দুই বাংলা নিয়ে আবেগপ্রবণ বক্তব্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরাগভাজন হন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল ফজলুল হক আমন্ত্রিত হয়ে কলকাতা

গিয়েছিলেন। সেখানে বক্তৃতা দেয়ার সময় তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে দুই বাংলা যে অভিন্ন তা বর্ণনা করেন। তার এই বক্তৃতার সূত্র ধরে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা সুযোগ পেয়ে যান। তারা দেখতে পেলেন এই বক্তৃতার রেশ ধরে ফজলুল হককে অপসারণ করা যেতে পারে। তাঁর বিলুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। প্রচার করা হয় ফজলুল হক ভারতের কাছে পূর্ববাংলা বিক্রি করে দিতে চান। একই সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো হতে থাকে। মে মাসে কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে কারা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং আদমজী জুট মিলে বাঙালি ও বিহারী শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক গোলযোগ হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ বলে দায়ী করতে থাকে। এই সময়ে 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ ফজলুল হকের এক সাক্ষাৎকার বিকৃত করে প্রকাশিত হয় যে তিনি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চান। এতে মুসলিম লীগ সরকার তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে ঘোষণা দেয়। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করেন। এ শাসন জারি ছিল ১৯৫৫ সালের ২ জুন পর্যন্ত। মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে মাত্র চার বছরে সাত মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। কেন্দ্রীয় সরকার তিনবার গভর্নরের শাসন জারি করে। যুক্তফ্রন্টের দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন বলবৎ ছিল।

সার-সংক্ষেপ

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকে পাকিস্তানি শাসক চক্রের শাসন ও শোষণের শিকার হয়ে পূর্ব বাংলার মানুষ মুসলিম লীগের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থায় ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। পূর্ব বাংলার মানুষ মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়। এভাবে পূর্ববাংলার কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বিপুল বিজয় অর্জন করে। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা। কিন্তু মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে অল্পদিনের মধ্যেই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়। তখন পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করা হয় এবং ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তা বলবৎ থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. প্রাদেশিক নির্বাচনের তারিখ ঠিক করা হয়েছিল —
   ক. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ
   খ. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল
   গ. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে
   ঘ. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন

২. নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে —
   ক. ৩০৯টি আসন
   খ. ২২৩ টি আসন
   গ. ২৭টি আসন
   ঘ. ১৩৬টি আসন

৩. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া হয় —
   ক. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে
   খ. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর
   গ. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল
   ঘ. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. কীভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল?

২. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের ফলাফল কি হয়েছিল?

৩. কোন কোন রাজনৈতিক দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।

পাঠ ৫

সংবিধান প্রণয়নে বিলম্ব, সামরিক শাসন ও তৎকালীন রাজনীতি (১৯৫৬-১৯৬৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান জারি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও তাঁর কার্যাবলির বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পর্যন্ত পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হচ্ছে সংবিধান। সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর বিভিন্ন পর্যায় হতে দ্রুত সংবিধান রচনার দাবি উত্থাপিত হয়। বিশেষ করে পূর্ব বাংলার পক্ষ থেকে সংবিধান প্রণয়নের জোড়ালো দাবি ওঠে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান ঘোষণা করা হয়। এটি ছিল সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সংবিধান। এ সংবিধানের মাধ্যমে 'পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্র' নাম ধারণ করে। পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলোকে একত্রিত করে এক ইউনিট গঠন করা হয় এবং নামকরণ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব বাংলার নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। সংবিধানে সকল বিষয়ে সংখ্যাসাম্য নীতি স্বীকৃতি হয়। বাংলা এবং উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেয়া হয়। তবে এই সংবিধানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ হিসেবে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়। পূর্ব বাংলার সুশীল সমাজ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরিস্থিতি অনুধাবন করে প্রতিবাদে সোচ্চার হন।

১৯৫৬ সালের সংবিধান

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন দ্বারা নতুন রাষ্ট্র পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে পাকিস্তান গণপরিষদ গঠিত হয়। এই গণপরিষদের দায়িত্ব ছিল একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর অনিহার কারণে এই কাজে বিলম্ব হয়। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে সংবিধান রচনার জন্য একটি মূলনীতি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব ছিল খুবই কম। মূলনীতি কমিটি ১৮ মাস পরে তাদের সুপারিশ ও প্রতিবেদন পেশ করে। এই কমিটির সুপারিশে পূর্ব বাংলার জনগণকে সবদিক থেকে বঞ্চিত করা হয়। ১৯৫০ সালের সেপ্টেমর মাসে এই প্রতিবেদনটি

প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদন প্রকাশের পর পূর্ব বাংলায় ব্যাপক প্রতিবাদ হয় এবং কমিটির সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করা হয়। মূলনীতি কমিটি ১৯৫২ সালে দ্বিতীয় এবং ১৯৫৩ সালে তৃতীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কিন্তু সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি অমিমাংসিত থেকে যায়। ১৯৫৫ সালে গভর্ণর জেনারেল পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৬ সালে সংবিধান রচিত হয়। এই সংবিধান চালু ছিল মাত্র দু বছর। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে সংবিধান স্থগিত করা হয়। সংবিধান স্থগিত করার সাথে সাথে পাকিস্তানে সাংবিধানিক শাসনের অবসান ঘটে।

প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ

গোলাম মুহাম্মদের পদত্যাগের পর ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। তাঁর অগণতান্ত্রিক আচরণ ও হস্তক্ষেপের ফলে ১৯৫৬-৫৮ সালের মধ্যে কেন্দ্রে তিনটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানেও রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের মধ্যে গোলযোগে পরিষদ কক্ষেই ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী আহত হন এবং পরদিন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর ঘটনাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে প্রেসিডেন্ট মির্জা বেসামরিক শাসন অবসানের উদ্যোগ নেন।

সামরিক শাসন জারি

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই শাসন ব্যবস্থায় একধরণের স্বৈরতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা মালিক ফিরোজ খানের সংসদীয় সরকার উৎখাত করে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। সেনাপ্রধান আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক শাসক নিযুক্ত করেন। সংবিধান বাতিল, আইন পরিষদ ও মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়। সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। মেজর জেনারেল ওমরাও খান পূর্ব বাংলার সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার গণতন্ত্র বিরোধী উপরোক্ত কার্যক্রমে প্রধান সহযোগী ছিলেন আইয়ুব খান। উচ্চবিলাসী আইয়ুব খান ২৭ অক্টোবর ২১ দিনের মাথায় ইস্কান্দর মির্জাকে পদচ্যুত করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন।

রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা

জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর পাকিস্তানের শাসন ও রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেন। তিনি কঠোর হস্তে দূর্নীতি দমন ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন। অতঃপর তিনি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ১৯৫৯ সালে 'পোডো' (Public Office Disqualification Order, PODO) এবং 'এবডো' (Elective Bodies Disqualification Order, EBDO) নামক দুটি আদেশ জারি করে রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ ও নির্বাচনে রাজনীতিবিদদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেন।

মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন

১৯৫৮ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের শাসন কাঠামো এবং রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন। ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে আইয়ুব খান গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করে একটি নতুন নির্বাচন কাঠামো প্রবর্তন করেন। তাঁর এই নির্বাচনের মূলভিত্তি ছিল 'মৌলিক গণতন্ত্র'। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংখ্যক

লোক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অধিকার লাভ করে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাকিস্তানের দুই অঞ্চল থেকে ৪০ হাজার করে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্য নির্বাচন করা হয়। আইয়ুব খান ৪ স্তর বিশিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় নিম্ন থেকে উচ্চ স্তরগুলো ছিল : ১. ইউনিয়ন পরিষদ (গ্রামে) এবং টাউন ও ইউনিয়ন কমিটি (শহরে), ২. থানা পরিষদ (পূর্ব বাংলায়) এবং তহশিল পরিষদ (পশ্চিম পাকিস্তানে), ৩. জেলা পরিষদ, ৪. বিভাগীয় পরিষদ। এই পরিষদগুলোতে নির্বাচিত এবং মনোনীত উভয় ধরণের সদস্য থাকতেন। এরাই জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ভোট দানের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ১৯৬০ সালে এসব মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে আইয়ুব খান পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন ও ১৯৬২ সালের সংবিধান

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণ পূর্ব-পাকিস্তানে অসন্তোষ বৃদ্ধি করে। ১৯৬১ সালের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুলুহয়। ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দীকে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। এই খবর পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্ররা সরকারবিরোধী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। গণতন্ত্র পুনলুজ্জীবনের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলন দমনে আইয়ুব সরকার গ্রেপ্তার নির্যাতন চালালে ছাত্র গণআন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এ অবস্থায় আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের ১ মার্চ একটি সংবিধান ঘোষণা করেন। সংবিধানে কেন্দ্র ও প্রদেশের মন্ত্রীসভা ও গভর্ণরের ক্ষমতা সংকোচিত করা হয়। প্রেসিডেন্টের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত করা হয়। বিচার বিভাগের ক্ষমতাও খর্ব করা হয়। এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ-সমাবেশ ও ক্লাস বর্জন করে। আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য আইয়ুব খান ও পূর্ব বাংলার গভর্ণর মোনায়েম খান ছাত্রদের ওপর কঠোর দমন নীতি চালান। ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে শরীফ কমিশনের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পেলে ছাত্র আন্দোলন নতুন রূপ লাভ করে। এ আন্দোলন 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন' নামে পরিচিত। ১৫ আগস্ট থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিদিন বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর হরতাল চলাকালে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র নিহত এবং কয়েক শত আহত হয়। ৮ জুন সামরিক আইন স্থগিত করে দলীয় রাজনীতির অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হয়।

রাজনৈতিক দলের পুনলুজ্জীবন

পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত হামিদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কমিশন রিপোর্ট বাতিল এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে ১৯৬২ সালে ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ শুলুহয়। এ অবস্থায় আইয়ুব খান 'রাজনৈতিক দলবিধি' প্রবর্তন করে পাকিস্তানে রাজনৈতিক দলের পুনলুজ্জীবন ঘটান। আইয়ুব খান নিজে 'কনভেনশন মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামী দল সক্রিয় হয়। এসময়ে সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নূলুল আমিনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ মিলে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা এন. ডি. এফ গঠিত হয়। এই ফ্রন্টের উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র পুনলুদ্ধার ও ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়া। এই ফ্রন্ট খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে শেখ

মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের পুনলুজ্জীবন ও পুর্নগঠন করেন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী গণ আন্দোলন পরিচালিত হয়।

১৯৬৫ সালের নির্বাচন

১৯৬৪ সালে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খান বিরোধী একক প্রার্থী দেওয়ার জন্য আবার আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দল মিলে 'সম্মিলিত বিরোধী দল' (Combined Opposition Party, COP) নামে একটি জোট গঠন করে। আইয়ুব খানের বিলুদ্ধে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কপের প্রার্থী হিসেবে ফাতেমা জিন্নাহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মৌলিক গণতন্ত্রীদের নিরঙ্কুশ সমর্থনে আইয়ুব খান ফাতেমা জিন্নাহকে সহজেই পরাজিত করতে সক্ষম হন। তিনি দ্বিতীয় বারের মত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় এবং মে মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফলও সরকারী দলের পক্ষে যায়। অবৈধ প্রভাব ও প্রশাসনিক যন্ত্রকে ব্যবহার করেই আইয়ুব খান নির্বাচনে জয় নিশ্চিত করেন। ফলে ১৯৬৫ সালের নির্বাচন পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে এই দুই দেশের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই কাশ্মীরকে তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করত। কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাক-ভারত যুদ্ধ শুলুহয়। ৬ আগস্ট পাকিস্তান বাহিনী ভারত আক্রমণ করলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুলুহয়। ৬ সেপ্টেম্বর ভারত লাহোর আক্রমণে অগ্রসর হয়। ১৭ দিন যুদ্ধের পর জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ২৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হয়। ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাক্ষরিত 'তাসখন্দ চুক্তি'র মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া

পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী চেতনা প্রবলভাবে জাগ্রত হয়। পাক-ভারত যুদ্ধ ও তাসখন্দ চুক্তি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে। কারণ যুদ্ধে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ছিল না। আইয়ুব খানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। এ যুদ্ধের সময় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক অসহায়ত্বের প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের অরক্ষিত অবস্থা প্রকাশিত হয়। তদুপরি যুদ্ধজনিত কারণে অর্থনীতিতে অহেতুক চাপ পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানের দাবী দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন।

সার-সংক্ষেপ

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচিত হয়। পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জার বিরোধী কার্যকলাপে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে উদ্ভুত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি করা হয়। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে পদচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর অগণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক ছাত্র গণ আন্দোলনের সূচনা করে। নানা রকম কূটকৌশল ও দমন নীপিড়ন সত্ত্বেও আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়। ১৯৬৬ সালে ছয়দফা আন্দোলনের মাধ্যমে তা আইয়ুবের শাসন ভিত্তিকে প্রকম্পিত করে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. পূর্ব বাংলার 'পূর্ব পাকিস্তান' নামকরণ করা হয় —
   ক. ১৯৪৭ সালে খ. ১৯৫০ সালে
   গ. ১৯৫৪ সালে ঘ. ১৯৫৬ সালে

২. মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন —
   ক. ইস্কান্দর মির্জা খ. মাওলানা ভাষানী
   গ. আইয়ুব খান ঘ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

৩. পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান রচিত হয় —
   ক. ১৯৫৬ সালে খ. ১৯৫৮ সালে
   গ. ১৯৬০ সালে ঘ. ১৯৬২ সালে

৪. ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে 'কপ' এর প্রার্থী ছিলেন —
   ক. আজম খান খ. ফাতেমা জিন্নাহ
   গ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঘ. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাষানী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মৌলিক গণতন্ত্র বলতে কি বুঝেন?
২. ১৯৬২ সালের সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৩. ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করুন।

পাঠ ৬

ছয়-দফা ও এগার দফা আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- ছয় দফা দাবি কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ছয় দফা উত্থাপন করার পর কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, তা বিশে- ষণ করতে পারবেন।
- এগার দফা আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

ভূমিকা

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে পূর্ব বাংলার জনগণকে মুক্ত করার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ছয় দফা দাবি আদায়ের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের চরম অবহেলা এবং এর পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সীমাহীন বৈষম্যের বিলুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সোচ্চার হন। ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে সবচেয়ে জনপ্রিয় দল ছিল আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ সময় এগিয়ে এলেন পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির সনদ নিয়ে। এই সনদটি ছিল ঐতিহাসিক ছয় দফা।

পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির সনদ ছয় দফা

১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধীদলীয় নেতারা একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু লাহোরে পৌঁছান। বিরোধী দলের সম্মেলন চলাকালে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করলে সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ তা প্রত্যাখ্যান করেন। বঙ্গবন্ধু সম্মেলন বর্জন করে সাংবাদিক সম্মেলন করে ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে ঢাকায় চলে আসেন। ২১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি: ছয় দফা-কর্মসূচি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। ছয় দফাতে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক দাবী। ছয় দফা কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ-

ছয় দফার কর্মসূচিসমূহ

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে। এটি হবে সংসদীয় পদ্ধতির যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা। প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আইনসভাগুলো হবে সার্বভৌম।

২. শুধু দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয় থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। অবশিষ্ট ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে।

৩. দেশের দুই অংশে সহজেই বিনিময়যোগ্য অথচ পৃথক দুটো মুদ্রা থাকবে। অথবা ফেডারেল ব্যাংকের অধীনে দুই দেশের দুটি রিজার্ভ ব্যাংক ব্যবস্থাসহ একই ধরনের মুদ্রা চালু থাকবে।

৪. আঞ্চলিক সরকারে হাতে থাকবে সকল প্রকার কর ধার্য করার ও আদায়ের ক্ষমতা। আদায়কৃত রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়া হবে।

৫. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রার আলাদা আলাদা হিসেব থাকবে। প্রয়োজনে দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে অথবা সংবিধানে নির্ধারিত হারে কেন্দ্র বৈদেশিক মুদ্রা পাবে।

৬. অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক সেনাবাহিনী অর্থাৎ মিলিশিয়া ও প্যারা মিলিশিয়া গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে।

ছয় দফার প্রতিক্রিয়া

১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয় দফা কর্মসূচি গৃহীত হয়। বঙ্গবন্ধু ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য দেন এবং ছয় দফাকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' আখ্যায়িত করেন। ফলে ছয় দফার পক্ষে দ্রুত জনমত গড়ে উঠে। ছয় দফা ঘোষিত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে নতুন আশার আলো দেখা দেয়। দিন দিন ছয় দফার কর্মসূচি জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। আইয়ুব খানের সরকার তাতে আতঙ্কিত হয়ে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ধরপাকড় শুলুকরে এবং প্রচার করেত থাকে যে, ছয় দফা হচ্ছে রাষ্ট্র বিরোধী আন্দোলন। তারা এই আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য দমন নীতি প্রয়োগ করতে থাকে। রাজনৈতিক নেতাদের উপর শুলুহয় হয়রানি ও নির্যাতন। ১৯৬৬ সালের ৮ মে শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়। এতে আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে প্রতিবাদী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ। আওয়ামী লীগ পালন করে প্রতিবাদ দিবস। নেতাদের মুক্তির দাবিতে ৭ জুন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতালের ডাক দেয়া হয়। সরকারের ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে প্রতিবাদী মানুষ মিছিল বের করে। এই দিন পুলিশের গুলিতে ১১ জন নিহত এবং বহুসংখ্যক লোক আহত হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ৮জুন প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দল ওয়াকআউট করে।

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা

ঢাকার রাজপথে ৬ দফার পক্ষে মিছিল

ছয় দফার গুলুত্ব

ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণার মাধ্যমে পাকিস্তান আমলে বাঙালির স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছায়। এই আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের পর্যায় শুলুহয়। তাই ছয় দফার গুলুত্ব ছিল অপরিসীম। ছয়দফার প্রতিটি দফাই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ এবং এ কারণে একে বাঙালির বাঁচার দাবি বলা হয়েছে।

১. **শোষণের বিলুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরঃ** পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের দীর্ঘকাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের বিলুদ্ধে প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ছিল ছয় দফা কর্মসূচি। বঙ্গবন্ধু ছয় দফাকে 'বাংলার কৃষক, মজুর, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত তথা আপামর জনসাধারণের মুক্তির সনদ এবং বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত পদক্ষেপ' বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি এটিকে বাঁচার দাবি ৬দফা বলে উলে- খ করেন।

২. **বাঙালি জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশঃ** ছয় দফা ছিল বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এ কারণে ছয় দফার প্রতি জনগণের সমর্থন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ছয় দফা আন্দোলন কঠোরভাবে দমনের ফলে নবজাগ্রত চেতনাবোধ বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। এর ফলে স্বায়ত্বশাসন দাবি জোরদার হয়।

৩. **আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিঃ** ছয় দফা ভিত্তিক দাবিগুলো ছিল বাঙালির প্রাণের দাবি, তাই এ দলটি ৬৬ সালের পর ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

৪. **স্বায়ত্তশাসনের দাবিঃ** ছয় দফার মধ্যে দিয়েই পূর্ব বাংলাকে একটি পৃথক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করে অধিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার দাবি করা হয়েছিল।

৫. **১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রভাবঃ** ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী কর্মসূচিতে ছয় দফা অন্তর্ভুক্ত করায় এ দলটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

৬. **মুক্তিযুদ্ধে প্রভাবঃ** ছয় দফাকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ অংকুরিত হয়। ৭০ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে বাঙালির স্বাত্তসাশনের বিষয়টি সময়ের ব্যাপারে পরিণত হয়। এভাবে ছয় দফা বাঙালি জাতিকে মুক্তির প্রেরণা দেয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছিল। ফলে ছয় দফার আন্দোলনকে থামিয়ে দেয়ার জন্য সরকার এবার নতুনভাবে ষড়যন্ত্র শুলুকরে। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী করে সরকার পক্ষ থেকে একটি মামলা করা হয়। সরকার পক্ষের অভিযোগ ছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অভিযুক্তরা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতে ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে গোপন বৈঠক করেছেন। সেই বৈঠকে ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে

পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। এ কারণে মামলাটির নাম হয় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। সরকারি নথিতে মামলার নাম ছিলো 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'। এটি ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা। শেখ মুজিব তখন জেলখানায় বন্দী। সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে আরও ৩৪ জনকে এই মামলার আসামী করা হয়। তাদের বিলুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় এই বলে যে, আসামীগণ ভারতের যোগসাজশে পূর্বপাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। অভিযোগে আরও বলা হয় যে, আসামীগণ ত্রিপুরা প্রদেশের আগরতলায় বসে এই ষড়যন্ত্র করেছিল।

আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত

বিচারকার্য চলার সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হয়। প্রতিবাদী মানুষ আসামীদের মুক্তি এবং মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিতে থাকে। অচিরেই এই আন্দোলন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে রূপ লাভ করে।

একটি ঘটনা আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তোলে। ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুলুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে কর্তব্যরত অবস্থায় বিনা কারণে হত্যা করা হয়। এ ঘটনা দ্রুত পরিস্থিতি অশান্ত করে তোলে। ২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান তাঁর পদত্যাগের ঘোষণা দেন। ২২ ফেব্রুয়ারি সকল গ্রেফতারকৃত নেতা মুক্তি লাভ করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি মুক্তিপ্রাপ্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে রেসকোর্স ময়দানে এক বিরল গণসংবর্ধনায় 'বঙ্গবন্ধু' খেতাবে ভূষিত করা হয়। ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন।

সার্জেন্ট জহুরুল হক

এগার দফা আন্দোলন

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মধ্য দিয়ে সামরিক শাসন ও আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলন যখন তীব্র হচ্ছিল তখন নেতৃত্বের পুরো ভাগে চলে আসে ছাত্ররা। এ সময়ে ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এই পরিষদ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এগার দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগার দফা কর্মসূচির ভেতর ছয় দফাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল শিক্ষা সংক্রান্ত বেশ কিছু দাবি। এগার দফা কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স বাতিলের কথা বলা হয়। তাছাড়াও শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের স্বাধীনতা, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়কগরণ, কৃষক ও শ্রমিকের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ, নিরাপত্তা আইন ও জলুরী আইন প্রত্যাহার এবং রাজবন্দিদের মুক্তি প্রভৃতি দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এভাবে ক্রমে ছয় দফা ও এগার দফার মধ্য দিয়ে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিতে থাকে।

সার-সংক্ষেপ

পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এ সময় এগিয়ে আসেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের

মুক্তির সনদ হিসেবে পরিচিত ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। এই দাবি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করলে পাকিস্তানি শাসকবর্গ ভীত হয়ে পড়ে। তারা আন্দোলনকারীদের উপর অত্যাচার চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে শেখ মুজিবসহ অনেক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু এই দমন নীতি তাদেরকে আরও প্রতিবাদী করে তোলে। অবশেষে আন্দোলনের মুখে সরকার প্রত্যাহার করে মামলা। তবে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন এতে থেমে যায়নি। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ছাত্ররা আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে আসে। ছাত্ররা উত্থাপন করে এগার দফা দাবি। ছয় দফা ও এগার দফা আন্দোলন ক্রমে গণ আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. ছয় দফা দাবি প্রথম উত্থাপন করা হয় —
   ক. ঢাকায় খ. লাহোরে
   গ. আগরতলায় ঘ. ইসলামাবাদে

২. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় —
   ক. ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি খ. ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ মে
   গ. ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে ঘ. ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চে

৩. সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন —
   ক. তোফায়েল আহমেদ খ. শেখ মুজিবুর রহমান
   গ. সার্জেন্ট জহুলুল হক ঘ. কিশোর মতিউর

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ছয় দফা দাবি কী?
২. ছয় দফার প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা কলুন।
৩. এগার দফা আন্দোলনের বর্ণনা দিন।

পাঠ ৭

১৯৬৯ সালের অভ্যুত্থান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- ৬৯ এর গণ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট কী ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ ঘটনাসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন।
- ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন দানা বাঁধে তা ছাত্রসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে শহরে ও গ্রামের শ্রমিক-কৃষক

ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিলুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে যা ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। আইয়ুব খানের পতনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের দুই অংশের মানুষ প্রথমবার একসাথে আন্দোলনে নামে। আইয়ুব খানের পতনের মধ্যে দিয়ে আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি জাতিগত নিপীড়ন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের সূত্রপাত করে। তাদের এই বৈষম্যের বিলুদ্ধে ভাষা আন্দোলন থেকে শুলুকরে ১৯৬০ এর দশকে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টিতে এই বিষয়গুলো গুলুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই আন্দোলন ছিল সবচেয়ে বড় আন্দোলন।

১৯৬৯ এর গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপট

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মূল কারণ ছিল আগরতলা মামলা দায়ের ও নেতাদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার, ছাত্রদের ওপর পুলিশী নির্যাতন। আর এ অভ্যুত্থানের পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ ও নির্যাতনের ফলে পাকিস্তানি শাসকদের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কোন আস্থা ছিল না। এর ফলে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতম হচ্ছিল। আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়েও আন্দোলন থামাতে পারেনি। ১৯৬৮ সালের একটি ঘটনা পরিস্থিতিতে আরও জটিল করে তোলে। এ সময় আইয়ুব খান তাঁর শাসনকালের উন্নয়ন দশক (১৯৫৮-১৯৬৮) পালনের আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের নিকট আইয়ুব খানের শাসন ছিল শোষণ বঞ্চনা আর নির্যাতনের দশক। এই উন্নয়নের দশক পালন মানুষকে ভীষণভাবে বিক্ষুদ্ধ করে তোলে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগের কিছু নেতৃবৃন্দকে জেল থেকে ছেড়ে দেয়ায় আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পায় এবং আন্দোলন আরও ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসের ছাত্র অসন্তোষ গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। ৬ ডিসেম্বর 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের জন্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন ও পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি মিলে পল্টন ময়দানে একটি জনসভা আয়োজন করে। জনসভার পর একটি বিরাট অংশ মিছিল করে গভর্ণর হাউস ঘেরাও করলে পুলিশের সাথে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এর প্রতিবাদে প্রধান বিরোধী দলগুলোর ডাকে ৮ডিসেম্বর সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। ১০ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ 'নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' পালন করে। ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ডাকসুর নেতৃবৃন্দ মিলে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার সাথে মিলিয়ে আরও কয়েকটি দাবি নিয়ে ১১দফা দাবি পেশ করে। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের ৮টি রাজনৈতিক দল মিলে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' (ডাক) নামক একটি মোর্চা গঠন করে ৮ দফা দাবি পেশ করে। এরপর 'ডাক' ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ প্রচেষ্টায় পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। 'ডাক' এর

আহ্বানে ১৪ জানুয়ারি সমগ্র পাকিস্তানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। হরতালে পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে ১৮ জানুয়ারি ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ধর্মঘটে পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ২০ জানুয়ারি সারা পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের গুলিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হন। আসাদের মৃত্যুর প্রতিবাদে ২২, ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষিত হয়। ২৪ তারিখে পুলিশ ছাত্রদের মিছিলে বাধার সৃষ্টি করলে বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত রাস্তায় নেমে এসেছিল ছাত্র জনতা। পুলিশের বাধা পেয়ে মিছিল আরও দুর্বার রূপ নেয়। মিছিলকারীরা সেক্রেটারিয়েট ভবন আক্রমণ করে এবং একাংশে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঢাকা নগরী বিপ্লবী মিছিলকারীদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এবার মিছিল সরকারী পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান ও সরকার সমর্থক দৈনিক **মর্নিং নিউজ** অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতদিন আন্দোলন ছিল ছাত্র ও আইনজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ২৪ তারিখে তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। মিছিলে যোগ দেয় রিকশা ও মোটর যানের চালক আর শ্রমিক সম্প্রদায়। আন্দোলন যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে তখন পুলিশকে সাহায্য করার জন্য শহরে ই.পি.আর নামানো হয়। ই.পি.আর বিভিন্ন স্থানে গুলি চালায়। এতে আন্দোলন না থেমে আরও বেগবান হয়। মিছিলে যোগ দিতে থাকে অধিকহারে যুবক ও সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ। ২৪ জানুয়ারির পর থেকে লাগাতার আন্দোলন ও হরতালে বহুসংখ্যক মানুষ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত ও আহত হন।

মতিউর

শহীদ আসাদ

৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান

১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া

১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুলুল হককে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর প্রতিবাদে জনতা আগরতলা মামলার বিচারপতির বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার ঢাকায় কারফিউ জারি করে। ১৮ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর শামসুজ্জোহাকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে। এরপর আন্দোলন আরও বেগবান হলে দেশের পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। আইয়ুব খান অবস্থা বেগতিক দেখে

শহীদ ড: মুহাম্মদ শামসুজ্জোহা

বিরোধী দলের নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন।কিন্তু বিরোধী দলীয় নেতারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান বাধ্য হয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি এক বেতার ভাষণে ঘোষণা দেন যে, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হবেন না। একই সাথে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে রাজবন্দিদের মুক্তির আদেশ ঘোষণা করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তি দেয়া হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ সদ্য কারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খানের সাথে গোলটেবিল বৈঠকে ছয় দফা ও এগার দফার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু অটল থাকেন।

গোলটেবিলের আলোচনা বারবার ব্যর্থ হতে থাকে এবং দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। মার্চ মাসে সেনাবাহিনীর গুলিতে ৯০জন নিহত হয়। অবশেষে ১০ মার্চের বৈঠকে আইয়ুব খান সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি ২২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খানকে সরিয়ে দিয়ে ড. এম এন হুদাকে নতুন গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তাতেও গণআন্দোলন শান্ত হয়নি। তখন তিনি ২৫ মার্চ সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খান বিরোধী গণঅভ্যুত্থান সফলতা অর্জন করে।

আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান

গণঅভ্যুত্থানের গুলুত্ব

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল আইয়ুব খানের শাসনামলে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আন্দোলন। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের বিলুদ্ধে যে ক্ষোভ ও প্রতিবাদের সৃষ্টি হয় তার সাফল্যজনক পরিণতি আইয়ুব খানের পতন। এ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সংসদীয় সরকার ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বীকৃতি মিলে। স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বাঙালির যে জাতীয়তাবোধ ১৯৪৮ সালে সৃষ্টি হয় তা পূর্ণতা পায় ঊনসত্তর সালের এই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান জাতীয় চেতনার প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের সময় এ ছুটি বাতিল করা হয়েছিল। ১৯৭০ সালের আওয়ামী লীগের বিজয়ের পেছনে ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের গুলুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৬৯-এর গণ আন্দোলন অত্যন্ত গুলুত্বপূর্ণ ঘটনা। আইয়ুব খানের দমন নীতি, শোষণ নিপিড়ন, নির্যাতন পূর্ব পাকিস্তানিদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত গণরোষ বিপ্লবী করে তোলে প্রতিবাদী মানুষকে। মানুষের মিছিলের জোয়ারে ঢাকার রাজপথ উত্তাল হয়ে উঠে। আন্দোলনে শরিক হয় সমগ্র পূর্বপাকিস্তান। পুলিশ আর সৈন্যরা গুলি চালিয়েও থামাতে পারেনি আন্দোলন। আন্দোলনের মুখে ভেঙ্গে পড়ে সরকারি প্রশাসন।

গণআন্দোলন গণ অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানের মুখে টিকতে না পেরে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন আইয়ুব খান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. আইয়ুব খান উন্নয়নের দশক পালন করেন —
   ক. ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে

২. পুলিশের গুলিতে আসাদ নিহত হন —
   ক. ২৩ জানুয়ারি খ. ২১ জানুয়ারি
   গ. ২৪ জানুয়ারি ঘ. ২০ জানুয়ারি

৩. আইয়ুব খান ক্ষমতা ছেড়ে দেন —
   ক. মোনেম খানের কাছে খ. ড. এম. এন হুদার কাছে
   গ. আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের কাছে ঘ. ড. শামসুজ্জোহার কাছে

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট বর্ণন কলুন।
২. গণআন্দোলনের ঘটনারসমূহের বিবরণ দিন।
৩. গণঅভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া আলোচনা কলুন।
৪. গণঅভ্যুত্থানের গুলুত্ব বর্ণনা কলুন।

মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট কী ছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- পাকিস্তানি শাসক ও ভুট্টোর ভূমিকা কি ছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনা করে বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

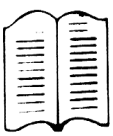

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের নির্বাচন অত্যন্ত গুলুত্বপূর্ণ। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খানের নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দেন। ২৮ নভেম্বর তিনি এক ভাষণে দেশে পুনরায় সর্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনের ঘোষণা দেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। একাধিক

রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নির্বাচনের ফলাফল ছিল ছয় দফাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করেন। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ মানুষের উপর আক্রমণ করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। বিজয় অর্জনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে ১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ এক বেতার ভাষণে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের ১জানুয়ারি থেকে সকল প্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে দেশে পুনরায় রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দেন। রাজনৈতিক দলগুলোর দাবির প্রেক্ষিতে ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদ ও ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। কিন্তু বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে যায়। পুনরায় তারিখ ঘোষণা করা হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু এবারও বাধা আসে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসে মানুষ ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্তু এরপরও নির্বাচনের তারিখ অপরিবর্তিত থাকে। শুধু উপকূলীয় অঞ্চলের জাতীয় পরিষদের ৯টি ও প্রাদেশিক পরিষদের ২১টি আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি।

নির্বাচনের ফলাফল

নির্বাচনে মোট ২৪টি দল অংশগ্রহণ করে। তবে নির্বাচনী প্রচারণায় মূলত আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রাধান্য লাভ করে। আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'নৌকা' প্রতীক নিয়ে ঐতিহাসিক ছয় দফার পক্ষে প্রচারাভিযানে নামেন। আওয়ামী লীগ ছয় দফা ও এগার দফার ভিত্তিতে এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৪৪টি আসনের মধ্যে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি ৮৮টি আসন লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি (১০টি মহিলা সংরক্ষিত আসন ছাড়া) আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮ টি আসনে জয়লাভ করে। এভাবে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ জয় লাভ করে। নির্বাচনে জয়লাভ করলেও আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজি ছিলেন না পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি তাদের এই বিমাতাসূলভ আচরণ মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচনা করে।

বঙ্গবন্ধুর নির্বাচনি প্রচারণা

নির্বাচনের গুলুত্ব

বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীন সর্বোভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন গুলুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে বাঙালির যে স্বাতন্ত্রবোধ তা স্বীকৃতি পায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর এটিই ছিল সবচেয়ে বেশি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। নির্বাচনে জয় লাভের মধ্যে দিয়ে বাঙালির স্বায়ত্তশাসন দাবির বৈধতার প্রমাণিত হয়। এর ফলে ভাষা ভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের বিজয়ের মাধ্যমে এ দলটির নেতৃত্ব জাতি মেনে নেয়। সর্বোপরি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এ নির্বাচন আপরিসীম ভূমিকা রাখে।

ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোর ভূমিকা

পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। ১৯৭০ সালে তাঁর দল জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ৮৮টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ জয়লাভ করায় সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান ও ভূট্টো আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য ষড়যন্ত্র শুলুকরেন। ষড়যন্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। তিনি ১৯৭১ সালের ১২ ও ১৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বৈঠক করেন। তিনি সাংবাদিকদের কাছে শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভাবি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মন্তব্য করেন। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা গেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন না ডেকে সময় ক্ষেপন করছেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় আসেন এবং ২৭ থেকে ২৯ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে ছয় দফার প্রথম ও ষষ্ঠ দফা মেনে নিতে রাজি হন। ইয়াহিয়া খান ১৪ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেন যে, সংবিধান প্রণয়নের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে ঢাকায় ৩ মার্চ। কিন্তু ভুট্টো ঘোষণা করেন ছয় দফা দাবির পরিবর্তন না করা হলে তিনি অধিবেশনে যোগ দেবেন না। ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর পরামর্শে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ হঠাৎ করে অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন। ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানিদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান

আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচিসমূহের মধ্য দিয়েই এ দেশ মুক্তিযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছে।

অসহযোগ আন্দোলন

১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে পাকিস্তানের সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্বের আসনে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানি সামরিক শাসক স্বাভাবিক পথে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। আন্দোলনের মাধ্যমে তা আদায় করে নিতে হবে। তাই তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে ১৯৭১ সালের ২ ও ৩ মার্চ হরতাল এবং ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে জনসভার কর্মসূচি ঘোষণা করেন। যথাসময়ে হরতাল কর্মসূচি পালিত হয়। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশের পর আ সা ম আবদুর রবের নেতৃত্বে ডাকসু নেতৃবৃন্দ কলাভবনে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। এই দিনে হরতাল চলাকালে মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে পূর্ব বাংলার মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আন্দোলন ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় । তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ৩ মার্চ পল্টনের জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র প্রচার করে। সভা থেকে বঙ্গবন্ধু ২-৬ মার্চ প্রতিদিন ভোর ৫-২টা পর্যন্ত হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই অবস্থাকে সামাল দিতে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার তারিখ নির্ধারণ করেন। এই সময় লেফট্যানেন্ট জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ও গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ি ১৯৭১ সালের ৭মার্চ রেসকোর্স ময়দানের সমাবেশে লক্ষ লক্ষ জনতার ঢল নামে। বঙ্গবন্ধু নির্দিষ্ট সময়ে রেসকোর্স ময়দানে সমাবেশে উপস্থিত হয়ে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধু এ সমাবেশে যে ভাষণ দেন তা বিশ্বের ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছে। এই ভাষণে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানান এবং দেশকে মুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল ৪টি। যথা:১. চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার, ২.সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া, ৩. গণহত্যার তদন্ত করা এবং ৪. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। এছাড়াও তিনি আরও কিছু দাবি উত্থাপন করেন। তিনি বাংলাদেশের সকল অফিস-আদালত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। এ সমাবেশে সরকারের কড়া নজরদারি ছিল। তাই কৌশলগত কারণে বঙ্গবন্ধু প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা না করে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তিনি প্রত্যক্ষ ঘোষণা দিলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হতো। তিনি মুক্তিসংগ্রামে সকলকে প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দেন। দেশকে শত্রুমুক্ত করতে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর ৭মার্চের এই ভাষণটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে 'বজ্রকণ্ঠ' নামে প্রচারিত হয়। ভাষণটি বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা পাগল জনগণের সর্বাত্মক অসযোগিতার কারণে সকল সরকারি কর্মকান্ড প্রায় অচল হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগ সদর দপ্তর হতে জারিকৃত আদেশ বলে পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসন চলতে থাকে। ১৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনার জন্য ৩৫ দফাভিত্তিক দাবিনামা জারি করেন। সেখানে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনসাধারণকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেয়া হয়।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

বঙ্গবন্ধু- ইয়াহিয়া খান আলোচনা

বঙ্গবন্ধুর আদেশ জারির পর থেকে শুধু সেনাবাহিনী ছাড়া সর্বত্র আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অবস্থার গভীরতা উপলব্ধি করে ইয়াহিয়া খান ১৫ মার্চ ঢাকায় আসেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দেন। বঙ্গবন্ধু আলোচনায় রাজি হলেও অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেননি। ১৬ মার্চ থেকে মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা শুলুহয়। একদিকে আলোচনা শুলুহয় অন্যদিকে ১৭ মার্চ টিক্কা খান, রাও ফরমান আলী 'অপারেশন সার্চ লাইট' বা বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকান্ড পরিচালনার নীলনকশা তৈরি করে। ১৯ মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যরা জয়দেবপুরে নিরীহ বাঙালিদের ওপর হামলা চালায়। এরপর ২২ মার্চ জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন। ভুট্টো ছয় দফার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা জটিল করে তোলেন। আসলে এভাবে তারা সময় ক্ষেপন করছিলেন। আর অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আর রসদ আনা হচ্ছিল এ দেশে। স্বাধীনতার আন্দোলন ক্রমে তীব্র হতে থাকে। চট্টগ্রামে জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে শ্রমিকরা অস্বীকার করে। ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবস। এদিন পূর্ব পাকিস্তানের ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলা হয়। ২৪ মার্চ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সংকট সমাধানের শেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু আলোচনা অসমাপ্ত রেখে ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন।

২৫ মার্চের গণহত্যা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক নিরস্ত্র বাঙালিদের নির্বিচারে গণহত্যা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র, নিরীহ, স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষের উপর হামলা করে নির্বিচারে হত্যাকান্ড চালায়। পাকিস্তানিরা বাঙালিদের হত্যার এই অভিযানের নাম দেয় 'অপারেশন সার্চ লাইট'। ২৫ মার্চ রাতে এই অভিযান পরিচালনা করলেও মূলত মার্চের প্রথম থেকেই তারা এর পরিকল্পনা করে। ১৯ মার্চ থেকে পূর্ব বাংলায় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণ শুলুহয়। ২০ মার্চ সরকার অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ জারি করে। ২৪ মার্চ চট্টগ্রাম

বন্দরে এম.ভি সোয়াত থেকে অস্ত্র ও রসদ খালাস শুলুহয়। সব প্রস্তুতি শেষে ২৫ মার্চ গণহত্যার জন্য বেছে নেয়া হয় এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে ঢাকা শহরের মূল দায়িত্ব দেয়া হয়।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যা

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ঢাকা ত্যাগ করে। যাবার আগে সেনাবাহিনীকে পূর্বপাকিস্তানিদের উপর আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে যান। ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ মোতাবেক গভর্নর টিক্কা খানের ঘাতক সৈন্যরা ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় গণহত্যার তান্ডবলীলা চালায়। এই গণহত্যা চলেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়, পুরনো ঢাকায়, কচুক্ষেত, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে, রায়ের বাজার, ধানমন্ডি, কলাবাগান, কাঁঠালবাগানসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় গণহত্যা শুলুহলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তা ওয়্যারলেসযোগে চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা বাণী শোনামাত্রই চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানার ইপিআর ঘাটি এবং রাজনৈতিক দলের কার্যালয়সমূহে আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। নৃশংস গণহত্যার সংবাদ যাতে বিদেশে ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্য ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ২৫ জন বিদেশী সাংবাদিককে আটক করা হয়। শুলুহয় পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে বাঙালি পুলিশ, আনসার ও সাধারণ মানুষের এক অসম লড়াই যা বাংলাদেশের ইতিহাসে মহান মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত।

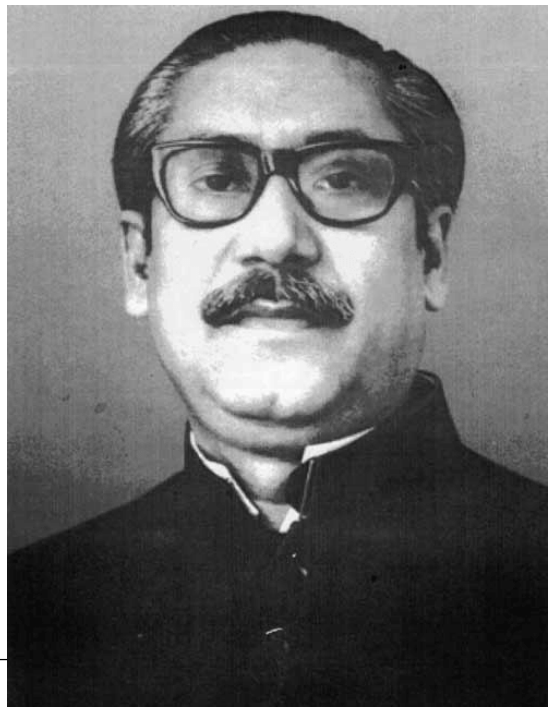

জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ছিল এ দেশের মুক্তিসংগ্রামের মাইলফলক ও প্রেরণার উৎস। বিভিন্ন সময়ে একাধিক

ব্যক্তি কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারিত হলেও এর বিষয়বস্তু ও নির্দেশনা ছিল একই। এই ঘোষণায় বঙ্গবন্ধুর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়েছে। ২৫ মার্চ দিবাগত রাত দেড়টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বমুহূর্তে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি এ ঘোষণা ওয়্যারলেসযোগে চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। এজন্যই ২৬ মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। মূল ঘোষণাটি ছিল ইংরেজিতে। এর বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে নিম্নরূপ:

'ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছে, যাহার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে লুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও। (বাংলাদেশ গেজেট, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী, ৩ জুলাই ২০১১)

স্বাধীনতার এ ঘোষণা বাংলাদেশের সকল স্থানে তদানীন্তন ইপিআর এর ট্রান্সমিটার, টেলিগ্রাম ও টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬ মার্চ দুপুরে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান চট্টগ্রামের বেতার কেন্দ্র থেকে একবার এবং সন্ধ্যায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে দ্বিতীয়বার প্রচার করেন। ২৭ মার্চ কালুরঘাটে স্থাপিত স্বাধীন বাংলা বিপ-বী বেতার কেন্দ্র (পরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র) থেকে মেজর জিয়াউর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং এর প্রতি বাঙালি সামরিক, আধাসামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর সমর্থন ও অংশগ্রহণের খবরে স্বাধীনতাকামী জনগণ উজ্জীবিত হয়। এরপর ১০ এপ্রিল প্রবাসে অস্থায়ী সরকার গঠিত হলে সরকারের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার ভিত্তিতে জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার আহ্বান জানানো হয়। এ ঘোষণায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হতে স্বাধীনতা ঘোষণা কার্যকর বলে গণ্য করা হয়। স্বাধীনতার পর সংবিধানে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস ঘোষণার মাধ্যমে একে প্রতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) গঠন

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী গণহত্যা শুলুকরলে প্রাথমিকভাবে পূর্ব প্রস্তুতি ও সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়াই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাদের বিলুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ ও গণহত্যা শুলুহলে পূর্ব পাকিস্তান হতে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের অধিকাংশ সদস্য প্রতিবেশি দেশ ভারতে আশ্রয় নেন। তারা একত্রিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। ১৩ এপ্রিল আগরতলায় অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের এক সভায় সরকার গঠন অনুমোদন করা হয়। ১৭ এপ্রিল অস্থায়ী সরকারের সদস্যগণ মেহেরপুর বৈদ্যনাথ তলায় শপথ গ্রহণ করেন। সরকারের প্রধান ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নাম অনুসারে বৈদ্যনাথ তলার নামকরণ করা হয় মুজিবনগর এবং সরকার পরিচিত হয় মুজিবনগর সরকার নামে।

আওয়ামী লীগের চীপ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী অস্থায়ী সরকারের (মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত) সদস্যদের শপথ পাঠ করান। শপথ অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ইউসুফ আলী

স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র পাঠ করেন। এ সরকার গঠনের মাত্র দুই ঘন্টা পর পাকিস্তানি বাহিনীর বিমান মুজিবনগরে বোমাবর্ষণ করে এবং মেহেরপুর দখল করে নেয়। ফলে মুজিবনগর সরকারের সদর দপ্তর কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে স্থানান্তরিত হয়।

মুজিবনগর সরকার: সালাম গ্রহণ

গার্ড অব অর্নার

মুজিবনগর সরকার

নাম	দপ্তর
রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
উপ-রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজলুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দিন আহমদ
পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়	খন্দকার মোশতাক আহমেদ
অর্থমন্ত্রণালয়	এম.মনসুর আলী
স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়	এ এইচ এম কামলুজ্জামান
প্রধান সেনাপতি	কর্নেল (অব.) এম. এ. জি. ওসমানী

উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন কারাগারে আটক থাকায় উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজলুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেয়া হয়। সরকারকে নীতি নির্ধারণী পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য ৯ সদস্যের একটি উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করা হয়। মাওলানা ভাসানী ছিলেন কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য। বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল। এসব বিভাগের মাধ্যমে যুদ্ধকালে সামরিক ও বেসামরিক যাবতীয় প্রশাসন পরিচালিত হয়।

অবলুদ্ধ বাংলাদেশ ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ জুড়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা নির্যাতন, গণহত্যা আর ধ্বংসলীলায় মেতে উঠে। তাদের প্রধান লক্ষ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ এদেশের ছাত্রসমাজ, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়। পাকিস্তানিরা বিশ্বাস করত পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলন সংগ্রামের পেছনে ভারতের ইন্ধনে হিন্দুরা কাজ করছে। রাজধানী ঢাকা ছাড়াও বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনী পৌঁছে যায়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশিয় দোসররা ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে। প্রায় ছয় লাখের অধিক মা-বোন পাকিস্তানিদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। পরিকল্পিতভাবে এদেশকে মেধাশূন্য করার জন্য পাকিস্তানি বাহিনী বরেণ্য সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি, শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। পাকিস্তানি

বাহিনীকে নির্যাতন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ইত্যাদি মানবতাবিরোধী অপরাধে সহযোগিতা করেছে রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও শান্তি কমিটি। পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সহযোগী এদেশিয় দোসররা এককথায় স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি হিসেবে পরিচিত। প্রধানত জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী, পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলের সমর্থকরা মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতা করে। অবলুদ্ধ বাংলাদেশ এই দলগুলো মানবতাবিরোধী অপরাধে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করেছে।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও সহযোগিতা দানের আহ্বান

বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা ছিল একটি উলে-খযোগ্য বিষয়। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বহির্বিশ্বের সমর্থন আদায়ের জন্য মুজিবনগর সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বহির্বিশ্বে বিশেষ দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজলুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও যুদ্ধে সার্বিক সহযোগিতার জন্য বিশ্বের সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানান। শত্রুর মোকাবেলা করে দেশকে মুক্ত করার জন্য দেশবাসীর প্রতিও আহ্বান জানানো হয়। এছাড়াও বাংলাদেশের নাগরিক এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সুইডেন, জাপান ও অন্যান্য কতিপয় প্রভাবশালী দেশের সমর্থন লাভের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালানো হয়।

মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনা

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। এ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করা। বাঙালি কর্মকর্তাদের নিয়ে সরকার প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করেন। এতে মোট ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল। বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের জন্য মুজিবনগর সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুলুত্বপূর্ণ শহরে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করে। ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের পর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক, বেসামরিক জনগণকে নিয়ে একটি মুক্তিযোদ্ধাবাহিনী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশকে প্রথমে ১০ এপ্রিল 8টি এবং পরবর্তীকালে ১১ এপ্রিল ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি সেক্টরেই নিয়মিত সেনা, গেরিলা ও সাধারণ যোদ্ধা ছিল যারা মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিফৌজ নামে পরিচিত ছিল। এসব বাহিনীতে দেশের ছাত্র, যুবক, কৃষক, নারী, রাজনৈতিক দলের কর্মী, শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে সরকারের অধীন বিভিন্ন বাহিনী ছাড়াও বেশ কয়েকটি স্থানীয় বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এই বাহিনীগুলোও পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দেশিয় দোসরদের বিলুদ্ধে যুদ্ধে গুলুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। এসব বাহিনী সরকারের আওতার বাইরে নিজস্ব পদ্ধতিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিলুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করে। মুজিবনগর সরকার আতাউল গণি ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করে। তিনি মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত করেন। তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস এর বাঙালি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত সৈন্য ব্যাটেলিয়ান ই পি আর পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে মুক্তি বাহিনীর নিয়মিত বাহিনী গঠন করা হয়। নিয়মিত সেনা ব্যাটেলিয়ান পরে তিনটি বিগ্রেডে পরিণত হয়। বিগ্রেড কমান্ডার মেজর শফিউল্লাহ, মেজর জিয়াউর রহমান এবং মেজর খালেদ মোশাররফের নামের ইংরেজি আদ্যক্ষর অনুসারে বিগ্রেড তিনটির নামকরণ করা হয় যথাক্রমে এস ফোর্স, জেড ফোর্স এবং কে ফোর্স।

মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে দীর্ঘ দিনের আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল। ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদান করে। মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতভেদ লক্ষ করা যায়। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর বড় অংশ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থাকলেও পিকিং পন্থী হিসেবে পরিচিত একটি অংশ বিরোধিতা করে। পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। এই দলগুলো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে অত্যাচার, নির্যাতন ও গণহত্যায় সহযোগিতা করে। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সমমনা বাম রাজনৈতিক দলসমূহ নিয়ে আওয়ামী লীগ একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (ন্যাপ-ভাসানী), মণি সিং (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি), মনোরঞ্জন ধর (বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস), অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ (ন্যাপ-মুজাফফর)। আওয়ামী লীগ থেকে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশিয় দোসরদের অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ এদেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। তাই মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, নারী, শিক্ষক, কবি, সাংবাদিক, চিকিৎসক, শিল্পীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ শামিল হয়েছে।

স্বাধীনতাবিরোধী শান্তি কমিটি, রাজাকার ও অন্যান্য বাহিনী গঠন

মুক্তিবাহিনীর ক্রমবর্ধমান তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে ১৯৭১ সালের ১২ আগস্ট ইয়াহিয়া খান গভর্নর টিক্কা খানের স্থলে ডা. আব্দুল মালিককে গভর্নর নিযুক্ত করেন। ডা. মালিকের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি বেসামরিক সরকার গঠন করা হয়। পাকিস্তান সমর্থক রাজনীতিবিদদের ও ধর্মভিত্তিক দল জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, পিডিপি, মুসলিম লীগের সমন্বয়ে একটি শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। দেশব্যাপী এর শাখা কমিটি গঠিত হয়। অত্যাচার, নির্যাতন ও গণহত্যায় এই সংগঠন দখলদার বাহিনীর বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে কাজ করে। পকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগি সংগঠন হিসেবে রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনী গঠন করা হয়। রাজাকারদের প্রশিক্ষণ দিতো পাকিস্তানি বাহিনী এবং প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল এক সপ্তাহ। জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্যদের নিয়ে গড়ে তোলা হয় আলবদর বাহিনী। এই বাহিনী বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রধান দায়িত্ব পালন করে। অন্যান্য ইসলামি ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীদের নিয়ে গঠিত হয় আল-শামস বাহিনী। এই বাহিনী গণহত্যায় সহযোগিতার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্যাম্প ও ব্রিজ পাহারা দিতো। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের সব সম্পদ-প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে। তাদের লক্ষ ছিল এই ভূখন্ডের মানুষদের হত্যা করে ভূমি দখল করে নেওয়া। পাকিস্তানি বাহিনীর এই সকল মানবতাবিরোধী অপরাধে সহায়তা করেছে এই দেশিয় বাহিনীগুলো।

পূর্ব পাকিস্তানের কিছু লোক পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে মানবতাবিরোধী অপরাধ গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগে সহযোগিতা করে যারা মানবতাবিরোধী অপরাধী হিসেবে পরিচিত। তাদের মধ্যে জামায়াত ইসলামীর নেতা গোলাম আযম, আব্বাস আলী খান, আব্দুল খালেক, মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ, পিডিপি নেতা নূরুল আমীন, মাহমুদ আলী, ফরিদ আহমদ, ইউসুফ আলী চৌধুরি, আবদুল জব্বার খান, মুসলিম লীগ নেতা সবুর খান, কাজী কাদের, ফজলুল কাদের চৌধুরী, আবদুল মতিন, আ.ন.ম. ইউসুফ, খাজা খয়েরুদ্দীন, আবুল

কাশেম, কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা মোহাম্মদ সোলায়মান, জাতীয় লীগ নেতা শাহ আজিজুর রহমান এবং ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতা মতিউর রহমান নিজামী, আবদুল কাদের মোল্লা, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ অন্যতম। এই দেশদ্রোহীরা প্রকাশ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। এ সময় অবরুদ্ধ বাংলাদেশে দেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী সমগ্র বাংলাকে বধ্যভূমিতে পরিণত করে।

মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের সমর্থন ও সাহায্য

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর নারকীয় তান্ডব বিশ্ববিবেককে নাড়া দেয়। বিভিন্ন দেশ নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রতিবেশি দেশ ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহের সরকার ও জনগণ সমর্থন ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিল। যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রায় এককোটি লোক ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারতের সরকার ও জনগণ বাংলাদেশী শরণার্থীদের ভরণ পোষণের দায়িত্বপালনসহ সবধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিল। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও সৌদীআরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের সরকার মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। ঐসব দেশের জনগণের মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ছিল গভীর সহানুভূতি ও সমর্থন। ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণ

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকেই কুষ্টিয়া, দিনাজপুর ও যশোরের বিস্তৃর্ণ অঞ্চল হানাদার বাহিনীর দখলমুক্ত হয়। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে ৪ ডিসেম্বর ভারত পাকিস্তানের বিলুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইন্দিরা গান্ধী সরকার ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতার জন্য ভারত সরকার মিত্র বাহিনী পাঠায়। মুক্তি বাহিনী ও মিত্র বাহিনী একত্রে যৌথ বাহিনী গঠন করে পাকিস্তান বাহিনীর বিলুদ্ধে প্রচন্ড আক্রমণ শুলুকরে। ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে যশোর সেনানিবাস, সাতক্ষীরা, মাগুরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, ভৈরব, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল মুক্ত করে যৌথ বাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে চলে আসে।

বুদ্ধিজীবী হত্যা

যৌথ বাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে আগমন ও ভারতীয় বিমান বাহিনীর ঢাকা আক্রমণের প্রেক্ষাপটে ১৪ ডিসেম্বর গভর্ণর মালিকের নেতৃত্বাধীন সরকার পদত্যাগ করে। এ সময় পাকিস্তান বাহিনী তাদের এদেশিয় দোসর রাজাকার, আলবদর ও আল শামস এর সহযোগিতায় ব্যাপক গণহত্যা চালায়। ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের খ্যাতিমান শিক্ষক, চিকিৎসক ও সাংবাদিকসহ অনেক বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশের ইতিহাস এ ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। হত্যাকান্ডের শিকার বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

মুক্তিযুদ্ধের শুলুথেকেই ভারত বিভিন্নভাবে বাংলাদেশকে সাহায্য সহযোগিতা করে। ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী মিলে 'যৌথ কমান্ড' গঠন করে। ৬-১৬

ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর সাথে ভারতের সেনা, নৌ, বিমানবাহিনীও পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে। যৌথ বাহিনীর দুর্বার আক্রমণে পর্যুদস্ত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অবশেষে আত্মসমর্পণে সম্মত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তান বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী ৯৩ হাজার সৈন্যসহ যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। পাকিস্তানের পক্ষে নিয়াজী এবং যৌথ বাহিনীর পক্ষে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। এতে অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার উপস্থিত ছিলেন। পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় সম্পন্ন হয়। বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণ

সার-সংক্ষেপ

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশিদের সবচেয়ে বড় অহঙ্কার। পাকিস্তানি শাসনযন্ত্রের কাছ থেকে পূর্ব পাকিস্তানিরা কোনরূপ সহানুভূতি লাভ করতে পারে নি; বরং পেয়েছে বঞ্চনা আর নির্যাতন। স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়া ছাড়া তখন তাদের আর করণীয় কিছু ছিল না। ফলে বাংলাদেশিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। নয় মাসের যুদ্ধে বিপর্যস্ত করে ফেলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে ভারতের মিত্র বাহিনী সাহায্যের হাত বাড়ায়। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি অনেক বেড়ে যায়। এরই পরিণতিতে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.৮

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় বসে সামরিক শাসন জারি করেছিলেন —

ক. ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ খ. ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ
গ. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ ঘ. ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ

২. ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসের নির্বাচনে ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ লাভ করে—
ক. ৮৮টি খ. ১৬৭টি
গ. ১০০টি ঘ. ১৫০টি

৩. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা দিয়েছিলেন—
ক. গণপরিষদের নির্বাচনে খ. ৭১-এর ২৫ মার্চে
গ. ৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরে ঘ. ৭ মার্চের ভাষণে

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট কি ছিল?
২. মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা লিখুন?
৩. বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন-১১ ঃ রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ভাষা সংস্কার কমিটি সম্পর্কে আলোচনা কলুন।
২. ভাষা আন্দোলনের পূর্বে যে সব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল তার বিবরণ দিন।
৩. একুশে ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিন।
৪. পূর্ববাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র কিভাবে বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল তা বর্ণনা কলুন।
৫. যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার বর্ণনা দিন।
৬. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচন ও এর ফলাফল আলোচনা কলুন।
৭. ছয় দফা আন্দোলন কি? বর্ণনা কলুন।
৮. এগার দফা আন্দোলনের বিবরণ দিন।
৯. ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের পটভূমি আলোচনা করে এর প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা কলুন।
১০. মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ আলোচনা কলুন।